International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-IV, February 2020, Page No. 23-27
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.16-22

অমাবস্যার গানে সাংস্কৃতিক উপাদান

সৌমিত্র নাথ

Abstract

Culture infuses soul into the continuos flow of social and individual life. It serves as the link between the past and the present. In this mechanical age and the era of the internet, whereas on the one hand culture faces dangers of extinction, on the other hand attempts are being made to preserve and safeguard it. In the novel, "Amabashyar Gaan," there has been an attempt not only to reflect upon the thousand year old human civilisational flow but also to reconnect man with his ancient roots. Notably, for his novel Narayan Gangopadhyaya could have easily chosen a contemporary character belonging to the modern times. But he in fact chose a religious and pious character who belonged to the medieval times. Thus, it can be said that his main concern has been to draw our attention to the culture of the bygone days.

Keyword : Krishna, Gouranga's picture, Jagannath, Chant, Vaishnava, Vrindaban.

‘অমাবস্যার গান’ (১৯৮১) উপন্যাসটির রচয়িতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ১৯১৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) ছেলেবেলা থেকেই লেখালেখি শুরু করেছিলেন। তিন খণ্ডে প্রকাশিত তার প্রথম উপন্যাস ‘উপনিবেশ’ (১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৬) পাঠকসমাজে বহু সমাদৃত হয়েছে। তার রচনার অনুপ্রেরণা যোগান উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র গদোপাধ্যায়, সুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, মন্মথসান্ন্যাল, সজনীকান্ত দাস ও ফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি শনিবারের চিঠির নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাছাড়া জীবনের শেষ সময়ে সপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় ‘সুনন্দ’ ছদ্মনাম লিখতেন। তিনি বড়দের জন্য যেমন গল্প উপন্যাস লিখেছিলেন তেমনি কিশোর সাহিত্য রচনায়ও তার খ্যাতি কম নয়। তিনি আনন্দ পুরস্কারসহ নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বাঙালির জীবনযাত্রা সংস্কৃতি, রোজকার সমস্যা, রাজনীতি নিয়ে লেখা অত্যন্ত জনপ্রিয় বাঙালি পাঠকের কাছে। বাংলার নিঃসর্গ ও নদ নদীর তরঙ্গমালা, সাংস্কৃতিক জীবন, বাঙালির সামাজিক জীবনধারা তাঁর রচনায় চিত্রিত হয়েছে। তাঁর ‘অমাবস্যার গান’ উপন্যাসটি রচিত হয়েছে ১৯৮১ সালে। কিন্তু এর আধার গঠন করেছেন ভারতচন্দ্রের জীবনী দিয়ে। ভারতচন্দ্র (১৯১২-১৭৬০), রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭২৮-১৭৮২), নবাব আলীবর্দী (১৬৭১-১৭৫৬) সিরাজদৌল্লা (১৭৩২-১৭৫৭) উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালীন বিপর্যয়ের সময়কে অমাবস্যার সঙ্গে তুলনা করে ঔপন্যাসিক উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্ মুহূর্তের সময়কালকে। জীবনের অন্বেষণে

জীবনের যন্ত্রণা, ব্যর্থতা, সার্থকতা চিত্রায়িত করতে গোটা সমাজের উপর আলোকপাত করেছেন লেখক। যেখানে অতি সহজেই স্পষ্ট হয়েছে নানা সাংস্কৃতিক উপাদান।

লোকায়ত সংস্কৃতি ধার করেই সংস্কৃতি গড়ে উঠে। লোকসংস্কৃতি ইংরেজিতে যাকে বলে ‘Folklore’। ‘Folklore’ এর ‘Folk’ শব্দটির বাংলার প্রতিশব্দ হিসেবে ‘লোক’ শব্দটি প্রচলিত। এই ‘লোক’ বলতে কোন একজন মানুষকে বোঝায় না। বোঝায় এমন একদল মানুষকে যারা সংহত একটি সমাজের বাসিন্দা অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডে তারা বসবাস করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলে এক ধরনের বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি, উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। তারা শহুরে কিংবা গ্রাম্য যে কোন জায়গারই বাসিন্দা হতে পারেন। ‘Lore’ বাংলা প্রতিশব্দে বলা হয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হচ্ছে অনুশীলন নির্ভর। কাল পরম্পরায় বহমান ক্রম পরিবর্তনশীল।

একটি নির্দিষ্ট জাতির ভাবপূর্ণ জীবন অংশ হচ্ছে লোকসংস্কৃতি। বিশেষ জীবনপ্রণালী থেকে গড়ে ওঠে লোকসংস্কৃতি। লোকেরা জীবনচর্যায় প্রচলিত পরম্পরাকে অবলম্বন করে চলে। ঐতিহ্যকে আকড়ে ধরে বাঁচে। লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে বলা যায় লোকেদের জীবনচর্যায় যেমন বিধি-নিয়ম ধান তোলা, পূজা পার্বণে শঙ্খ বাজানো, বাড়িতে বিশেষ দিনে আলপনা আঁকা, বিবাহ নানা ধরনের নিয়ম মেনে চলা, শ্রাদ্ধাদি কর্ম, অন্নপ্রাশন ইত্যাদির বিধি-নিয়ম, একাদশীতে অন্নগ্রহণ না করা, বিভিন্ন পূজা-পার্বণ করা ইত্যাদি। লোকসংস্কৃতির প্রকৃতি বিচার করে একে প্রধান কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন বস্তুকেন্দ্রিক, বিশ্বাস- অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক, খেলাধূলাকেন্দ্রিক, বাক্‌কেন্দ্রিক, অঙ্গ-ভঙ্গিকেন্দ্রিক, লেখন বা অঙ্কন কেন্দ্রিক। বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উদাহরণ হিসেবে পাই মানুষের ঘরবাড়ি, খাদ্যপানীয়, পরিধান ও প্রসাধন দ্রব্য, যানবাহন, বাদ্যযন্ত্র, কৃষি ও শিকার সরঞ্জাম ইত্যাদি।

বাক্‌কেন্দ্রিক বা মৌখিক ধারার লোকসংস্কৃতি মূলত মানসজাত স্মৃতিবাহিত ও শ্রুতিনির্ভর লোকসংস্কৃতির এই ধারাটি মুখে মুখে প্রচলিত। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গীত, ব্রতের ছড়া, বিয়ের অনুষ্ঠানে গাওয়া গানগুলি এই শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। বিশ্বাস-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি হচ্ছে লোকবিশ্বাস, লোক সংস্কার, লোক প্রথা, লোক অনুষথান এবং লোক উৎসবকে বোঝায়। লোকবিশ্বাস আচরনে কার্যকর হলে তাকে লোক সংস্কার বলে। বিয়ে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ইত্যাদি লোক প্রথা। নবান্ন, পৌষসংক্রান্তি ইত্যাদি লোক উৎসব।

লোকনৃত্যগুলিকে অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির নিদর্শন গণ্য করা হয়। লিখন বা অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বলতে আল্পনা, দেওয়ালচিত্র, মাটিরঘট, পটচিত্র, কাঠ বা পাথরে খোদিত নানা ধরনের কারুকার্য এই শ্রেণিভূক্ত ।

উপন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমেই আমাদের লোক সংস্কৃতির বাহক গৌরাঙ্গকে স্মরণ করেছেন। লোকায়ত জীবনের ভক্তির কেন্দ্র পুরী ধামের সঙ্গে জগন্নাথ মহাপ্রভু ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে স্মরণ করেছেন তিনি। তৎসঙ্গে স্মরণ করেছেন কৃষ্ণকেও। কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, জগন্নাথ, শঙ্কর, অন্নপূর্ণা এদের জীবনের সঙ্গে মানুষের আস্থা, ভক্তি, বিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে। বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতিতে আজ যেমন আমরা বিশ্বে শ্রেষ্ঠ-স্থান অধিকার করছি, অপরদিকে আমরাই আমাদের ধ্বংসের প্রস্তুতি নিচ্ছি। অতীত আমাদের ভবিষ্যতের সঠিক পথ নির্দেশ করে কিন্তু বৈজ্ঞানিক দ্রুত অগ্রগতিতে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের অতীত। মানুষের মধ্যে স্নেহ, মায়া, মমতা, পরোপকারের অভাব এবং আত্মচিন্তা প্রধান হয়ে উঠেছে। বর্তমানে FB, Whatsapp তথা অন্যান্য Social media তে এর জাগরণ এবং উত্তরণের প্রয়াস অবশ্য পরিলক্ষিত। আমরা আমাদের অতীত

জীবনপ্রণালী ও ব্যবস্থা সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর। কেননা আমাদের সহজ সরল জীবনই, পরিবেশ মুখর পৃথিবী অধিক জীবনমুখী। কিন্তু আজকের যান্ত্রিক পৃথিবী জীবনবিমুখ হয়ে পড়েছে। দুর্ঘটনা, বিচিত্র কঠিন রোগের কবলে মানুষ যে কোন মুহূর্তে পড়তে পারে। ব্যস্ত জীবনে কতজন লোকে গুরুনাম ও আরাধ্যের (ভগবানের) নামজপ করতে পারে। সৃষ্টিকর্তা বিভিন্ন রূপে সামাজিক সংযোগ সাধনে হাস্যরসের জোগান দিচ্ছেন। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রথম থেকেই ইতিহাসের বিষয় কেন্দ্রায়িত করে এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যেন রচনা করেছেন। যেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, ঈশ্বরও মানুষের পাশে রোদ, তাপ ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করেন। যেখান থেকে মানুষ খুঁজে পায় শান্তি। মানুষকে তিনি ভাব নির্ভর হতে বাধ্য করেছেন।

আমাদের সংস্কৃতি যা বিভেদের মধ্যে ঐক্যের কথা বলে। চৈতন্য সবাইকে কৃষ্ণনামে এক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যান্ত্রিক হয়ে পড়া পৃথিবী ক্রমে একাকীত্ব বরণ করছে। মানুষ ইন্টারনেটের সংযোগে সংঘবদ্ধ হলেও সেখানে যেন কৃত্রিমতা ধরা পড়ে। যেখানে মানুষের সরাসরি, সামনা-সামনি অভ্যন্তরীণ অন্তরের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বহু মানুষ হতাশা, নিরাশা ও আত্মগ্লানিতে ভুগছে। নাম, যশ, ধন প্রাপ্তিতে মানুষ মানবতা হারিয়ে ফেলছে। উপন্যাসে রাজার পাইকদের হাতে নিরীহ প্রজার কর দিতে না পারায় অত্যাচারের ছবি পাওয়া যায়। চাষবাস আমাদের সংস্কৃতিরই অঙ্গ লোকে জীবিকা নির্বাহে চাষবাস করে আসছে কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রম করার পরেও সময়ে সময়ে দেখা যায় তারা লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত। তাদের চোখভরা আতঙ্ক, রাজা বা জমিদারের কর দিতে দিতে তাদের সর্বস্ব দিয়ে দিতে হয়। এ উপন্যাসেও দেখা যায় ত্রিশ-চল্লিশজন চাষী প্রজা, একদল পাইক ঘিরে আছে তাদের। ঔপন্যাসিক ভারতচন্দ্রকে এঁকেছেন ঐতিহ্যমুখী করে। জীবন নির্বাহে অক্ষম কবি তীর্থের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। তবে, রঘুনাথের হাত ধরে সংকীর্তনের আসর থেকে আবার তাকে সংসার জীবনে ফিরিয়ে আনেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসে ধরা পড়ে আমাদের সংস্কৃতির সংস্কৃত। স্বাধীনতা পরবর্তী দিনে আমাদের সংস্কৃত হারিয়ে যাচ্ছে। সংস্কৃত পড়াটাও ছিল আমাদের সংস্কৃতি। ঔপন্যাসিক লিখছেন ভারতচন্দ্র যে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে সংস্কৃত পড়েছেন- দেশে ফেরবার সঙ্গে ঝড় উঠল। লিখেছেন-

বাবা মুখ ফিরিয়ে রইলেন, মা অভিমানে ঘরে দরজা বন্ধ করেলেন, তিন দাদা সমস্বর্ব বলতে লাগলেন, ‘ছি ছি ভারত তোর এই কাজ? ভেবেছিলুম তোর বুদ্ধি আছে, লেখাপড়া শিখে ভাঙা সংসারটাকে তুই দাঁড় করাবি- আর তুই পড়ে এলি সংস্কৃত? কী হবে সংস্কৃত দিয়ে, এ কালে কে তার কদর করে?”[১]

বৈদিক সংস্কৃত থেকেই ক্রমান্বয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত সংস্কৃতেই রচিত। কিন্তু আজ ইংরেজির প্রভাবে সংস্কৃত অবদমিত।

লোকজীবনে মানুষের দৈনন্দিন চলার পথে সাধারণ ব্যবহৃত শব্দাবলীর প্রয়োগ উপন্যাসে পাওয়া যায়। যেমন বৈষ্ণব, বৃন্দাবন, নন্দদুলালের মন্দির, নিতাই গৌরাঙ্গের পট, পিতলের বাল-গোপাল, বড় কাঁসার থালা, কলা-নারকেল, খোল, গোপীনাথজীর মন্দির এগুলো অতি সহজে পাওয়া লোকজীবনের প্রচলিত শব্দে এবং ব্যবহার্য বস্তু।

ঔপন্যাসিক লোকগানেরও উল্লেখ করেছেন-

“জয় কৃষ্ণকেশব   রাম রাঘব
কংসদানব ঘাতন

জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন
কুঞ্জকানন রঞ্জন।
জয় কেশিমর্দন কৈটভার্দন
গোপিকাগন মোহন।”[২]

কৃষ্ণভজন, গোবিন্দভজন, গৌরাঙ্গভজন ইত্যাদি আজও সমাজ জীবনে প্রচলিত আছে এবং ভবিষ্যতে ক্রমর্বধমান। ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন-

“মন্দিরের সামনে তখন সংকীর্তনের আসর বসে গেছে মাথুর শুরু হয়েছে, ভক্ত গায়ক গান ধরেছেন-

“অক্রূর সারথি নিরদয় অতি
রথ যায় দূরে চলে-
আর গোপিকার প্রাণ ভেঙে খান খান
ব্রজ ভাসে যে নয়নজলে”[৩]

ভক্তি, ঈশ্বর বিশ্বাস, গান-কীর্তন ইত্যাদি আমাদের লোকজীবনের অঙ্গ প্রাচীনকাল থেকেই। ভক্ত হৃদয় ভগবানের জন্য চিরকালই প্রাণচঞ্চল। ভারতচন্দ্রের স্ত্রী লীলার সঙ্গে তাঁর আঠারো বছর পরের মিলন দৃশ্যে আমাদের সংস্কৃতির নারীর আভূষণ কেমন ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়- ‘লাল শাড়ি, অলঙ্কারের শিঞ্জন। কপালে সিঁদুরের টিপ।’

লীলা চরিত্রে আরও পাওয়া যায়-

‘দুচোখে ভয় আনন্দ আর চোখে ছলো ছলো জল নিয়ে পায়ে লুটিয়ে করেছেন লীলা। পরম স্নেহে দু’হাতে তাকে তুলে ধরেছেন ভারতচন্দ্র।’ ভারত মুছিয়ে দিলেন লীলার চোখের জল এবং বলেন যে অপদার্থ স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণ করতে পারে না পালিয়ে যায়, আমি তাদেরই একজন। লীলার মনেও গুঞ্জন ওঠে,

“বধূ, কি আর বলিব আমি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইয়ো তুমি।”[৪]

নারী পুরুষের এই ভাবটিও আমাদের সংস্কৃতিজাত। উপন্যাসে প্রবাদপ্রতীম বাক্যের উল্লেখ রয়েছে যেমন,

১। ‘আপনি স্বয়ং দাতাকর্ণ, আপনার দর্শনলাভেও জীবন ধন্য হয়’।

২। ‘খাইয়া প্রসাদী ভাত মাথায় মুছিব হাত’। অর্থাৎ কিনা কোন জাতের বিচার নেই। চণ্ডাল এসেও ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারে।

৩। ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে উল্লেখ করা পংক্তি হিসেবে উপন্যাসে পাওয়া যায়,

“ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটালাম কাল্
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল-”[৫]

এখানে সাধারণ মানুষের দুঃখ জর্জরিত জীবনকথা ভিখিরী শিবের জীবন দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসে লোকজীবনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দুর্গাপূজার আয়োজনেরও উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে এই দুর্গাপূজা বিশেষ একটি জাতিগোষ্ঠী থেকে উন্নীত হয়ে সমগ্র মানবস্রোতের প্রধান উৎসবে পরিণত। দুর্গাপূজা উপলক্ষে উপন্যাসে সাজ-সরঞ্জামের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমনটা অতীত থেকে বর্তমানে বহমান। উপন্যাসে মহানবমীর চিত্রে পাই-

"মন্দিরা বাজছে, করতাল বাজছে, মৃদঙ্গ বাজছে। ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় চারদিক ঝকমক করছে দিনের আলোর মতো; সামনে ডাকের সাজ আর শল্‌মা-চুমকিতে অপূর্ব সুন্দর বিরাট প্রতিমা যেন দেবলোকের দ্যুতিতে ঝলমল।"[৬]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যয় সময়ের নির্যাস হিসেবে সামগ্রিক যে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এতে মানুষের জীবনচর্যা, বিশ্বাস, দুঃখ-ব্যথা, জীবনে চলার লড়াই পূজা পার্বণ নিয়ে লোকসংস্কৃতি সমন্বিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের অতীত দিনের পরম্পরার সাথে সংযোগ সূত্র হচ্ছে লোকসংস্কৃতি। আলোচ্য উপন্যাস হাজার হাজার বছরের জীবনের ইঙ্গিত এবং মানুষকে শেকড়ের সাথে সংযুক্ত রাখার প্রয়াস রয়েছে।

আজকের যান্ত্রিক পৃথিবীতে ভারতচন্দ্রের মতো ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির জীবন অবলম্বনে ঔপন্যাসিক আমাদের কাছে মূল্যবোধের টানাপোড়ন, প্রতিভার অপচয়ের ক্ষোভ, তাঁর কাব্যের অনুপ্রেরণা, ধর্মচিন্তার রূপ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যেন এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচনা করলেন।

তথ্যসূত্র:

১। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী,' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৫, পৃঃ- ১২
২। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী,' অনুরূপ, পৃঃ-৫
৩। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী,' অনুরূপ, পৃঃ-৮
৪। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধায় রচনাবলী', অনুরূপ, পৃঃ-২৩
৫। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী', অনুরূপ, পৃঃ-৭৫
৬। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী', অনুরূপ, পৃঃ-৬৭